Parikatha – Prabandho – Others – Samaj O Projukti – Ashok Mukhopadhyay
পরিকথা - সমাজ ও প্রযুক্তি - অশোক মুখোপাধ্যায়

।। পরিপ্রেক্ষিত ।।

সমাজ ব্যাপারটা নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে ও হবে। সমাজবিজ্ঞান নিজেই একটা শাস্ত্র এবং ওই শাস্ত্র বিষয়ে আমার ধারণা খুবই কম, নেই বললেই হয়। তবে সমাজ বলতে আমার মতো অনেকে কিছু একটা বুঝি। সমাজবিজ্ঞানী এবং ওই শাস্ত্রের ছাত্ররা আরওঅনেক কিছু বোঝেন। এই লেখার পরিসরে আমরা সমাজের এইরকম একটা সংজ্ঞা ধরে নেব। প্রাণীদের গোষ্ঠীবদ্ধ অবস্থান এবং পরস্পরনির্ভরতা। গোষ্ঠী নানারকম হতে পারে। বাঙালিসমাজ, ইঙ্গ - বঙ্গসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ, পাঠকসমাজ, পল্লিসমাজ, মধ্যবিত্তসমাজপ্রভৃতি এবং সর্বোপরি মানবসমাজ। 'চলো যাই কাজে মানবসমাজে'। সবরকম সমাজের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। গ্রামের সমাজ আমি খুবই কম দেখেছি। প্রধানত চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তদের সঙ্গেই আমি পরিচিত এবং তা-ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

শোনা যায়, পৃথিবীর সব প্রাণীর মধ্যে মানুষই নাকি শ্রেষ্ঠ, এবং এই সার্টিফিকেট মানুষই নিজেদের দিয়েছে, কোনো হাতি কিংবা বাঘ দেয়নি। মানুষের বুদ্ধি আছে, প্রযুক্তি আছে যা দিয়ে পৃথিবীর অনেক প্রাণীকে তারা শেষ করেছে ও করছে। খেয়ে ফেলেছে, মেরে তার চামড়া দিয়ে নানান জিনিস বানাচ্ছে, তাদের মুণ্ডু ঘরের দেওয়ালে সাজাচ্ছে। আবার এমন কিছু মানুষ প্রাণী বাঁচাও, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করো, পরিবেশষ দূষণ বন্ধ করো, চোরাশিকারিদের শাস্তি দাও, এইসব স্লোগানও তুলছে। এই মানুষ ব্যাপারটা সত্যিই একটা অনাসৃষ্টি। পৃথিবীতে মানুষ না এলে বন্যেরা বনে সুন্দরই থাকত। পরিবেশের ভারসাম্যও বজায় থাকত এবং তারজন্য দুঃখ অথবা সুখ করার কেউ থাকত না, কারণ মানুষই তো নেই, কে আর দুঃখ করবে। কিন্তু একথা এখন বলে কী হবে, প্রকৃতির জগতে বৃহত্তম দুর্ঘটনা, মানুষের উদ্ভব, তো হয়েই গেছে। কী আর করা যাবে।

মানুষের কতগুলো লক্ষণ আছে যা অন্যপ্রাণীর নেই। সামান্য কয়েকটি শারীরিক কাজকর্ম ছাড়া মানুষকে সব কিছুই কষ্ট করে শিকতে হয়। হাঁটতে শিখতে বছর ঘুরে যায়। কেবলমাত্র ঠোঁট এবং পা দিয়ে বাবুই যেরকম বাসা বানায়, কিছু খড়কুটো, দুটো হাত, দশটা আঙুল, সুতো, আংটা, স্ক্রুড্রাইভার এবং হাজার যন্ত্র দিয়েও মানুষ ওইরকম বাসা বানাতে বা বুনতে পারবে না। মানুষকে সাঁতার শিখতে হয়, দৌড়োনো শিখতে হয়। আচ্ছা তা না হয় হল, কিন্তু যে বৈশিষ্ট্যটির জন্য মানুষ নিজেদের অন্য সব প্রাণীর ওপরে স্থান দিয়েছে, সেটি হল মানুষই পৃথিবীতে একমাত্র হিংস্র প্রাণী। কোনো বাঘ অন্য কাউকে মেরে তার মাথাটি টালির নালায়, দু-টি হাতজগদ্দলে, আর ধড়টি ট্রাঙ্কে পুরে পাঞ্জাব মেলের সিটের তলায় রেখে দেয়নি। মানুষের সমাজে এই ধরনের ঘটনা রোজই ঘটছে,নাঘটলে বাংলা নিউজ চ্যানেল, অনেক খবরের কাগজ উঠে যেত। ট্রেনে কাটাপড়া বিকৃত শরীর দেখতে মানুষ ভিড় করে। হিন্দি সিনেমার ফাইটিঙের দৃশ্যে রক্তাক্ত মানুষের বীভৎস মুখের ক্লোজ আপ দেখার জন্য মানুষ খাবারের তালা হাতে নিয়ে টেবিল থেকে উঠে টিভির সামনে দাঁড়ায়। আধুনিকতম প্রযুক্তির চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রতিদিন যত মরণাপন্ন লোকের প্রাণ বাঁচায়, আধুনিকতম প্রযুক্তির মারণাস্ত্র প্রতিদিন তার চাইতে অনেক বেশি লোককে মারে। চ্যানেল সার্ফ করুন, মৃতের সংখ্যাটা পাবেন। বেঁচে-ওঠা লোকদের সংখ্যাটা পাবেন না, ওই খবর পাব্লিক খাবে না।

ভূমিকাটা নেতিবাচক হচ্ছে, এবং একটু দীর্ঘও বটে। আরও একটু নেতি থাকবে। মানুষ স্বভাবত যুক্তিবাদী নয়, কুযুক্তিবাদী। বিজ্ঞানমঞ্চের কর্মী, যুক্তিবাদী সমিতির কর্মীদের জিজ্ঞাসা করুন; জানবেন এইসব কাজের সময় তাঁদের কী পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয় ও কতরকম বাধার সামনে তাঁরা পড়েন। ফল যে একেবারেই পান না, তা নয় এবং চেষ্টাটা তাঁরা চালাচ্ছেন এটাই আশার কথা।

মনুষ্যকুলে কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ চিরকালই ছিলেন এবং থাকবেন, যদিও সংখ্যায় তাঁরা নিতান্তই কম। তাঁদের চরিত্রে হিংসা নেই, যুক্তিবাদ আছে। 'তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো-'। তাঁরা অন্যরকম কথা অন্য মানুষদের শোনাতে চেয়েছেন, এবং সমকালে লাঞ্ছিত ও পরে পরে পূজিত হয়েছেন। এই মানুষদের হাতেই তৈরি হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি। আমরা আধুনিক প্রযুক্তি। আমরা আধুনিক প্রযুক্তির কথাই বলব, কেননা কে না জানে, প্রযুক্তি ও মানুষের ইতিহাস সমান্তরালভাবেই চলেছে। পাথরের কুঠার, আগুনকে নিয়ন্ত্রণ, মাথার ওপর ছাউনি নির্মাণ, চাকা, পশুচর্মে শীত নিবারণ সবাই তো প্রযুক্তি' বিষয়ে আমরা আমাদের সমাজটাকেই প্রাধান্য দেব এবং সেটা করব, বঙ্গিমচন্দ্রের একটি বহুপঠিত প্রবন্ধের সূত্র ধরে। বঙ্গদর্শনে এটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে। নাম 'বঙ্গদেশের কৃষক'। যার শুরু,

> 'আজি কালি বড় গোল শুনা যায়, যে আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এত কাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাজের শাসনকৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি।
>
> কি মঙ্গল দেখিতে পাইতেছ না? ঐ দেখ, লৌহবর্ত্মে লৌহতুরঙ্গ, কোটি উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে অতিক্রম করিয়া, এক মাসের পথ একদিনে যাইতেছে।' প্রভৃতি।

এক প্যারাগ্রাফ জুড়ে ওই প্রবন্ধের শুরুতে বঙ্কিমচন্দ্র রেলগাড়ি, স্টিমার, টেলিগ্রাফ, চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি, যেখানে 'ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস ছিল' সেই জায়গাটার 'অট্টালিকাময় হইয়া' আসার কথা বলছেন। 'গ্যাসের আলো', 'কার্পেট', 'ঝাড়', 'ক্যান্ডেলাব্রা', 'দূরবীন' প্রভৃতির কথাও বলছেন। সবই সেই আমলের প্রযুক্তির দান। কিন্তু তার ঠিক পরের অনুচ্ছেদেই ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রশ্নটি তোলেন, আজ ২০০৬ সালেও তার সদুত্তর দিতে পারিনি আমরা, পারিনি কম্পিউটার- শাসিত শিল্পায়নমুখী আমরা।

বঙ্গিমচনেদ্রর প্রশ্নটি এইরকম,

> 'এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল হাসিম শেখ আর রাম কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায় খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়ে দুটি অস্থিচর্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে?

আর দরকার নেই। আজও, এই লেখার ১৩৩ বছর পর কি ছবিটা খুব - একটা বদলেছে? কিছুটা বদল নিশ্চয় হয়েছে, কালের স্বাভাবিক নিয়মে তা হবেই। কিন্তু তখনকার 'বাবুদের' সঙ্গে তখনকার 'হাসিম - রামাদের' যে পার্থক্য ছিল, এখন সেটা আরও বেড়েছে। হরিয়ানা পাঞ্জাবের কিছু চাষি অবশ্যই চাষের কাজে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু অন্যত্র? প্রসঙ্গটএখন একটু পালটাব। এই পর্যন্ত পড়ে যদি কেউ ধরে নেন যে বর্তমান লেখকের একমাত্র কাজ মানুষের দোষ দেখা, এবং সকল নতুন প্রযুক্তিকে বাধা দেওয়া, তবে তিনি ভুল করবেন। কেন, তার উত্তর পরে হবে।

।। প্রযুক্তি শব্দটা ।।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, এবং চলন্তিকায় ' প্রযুক্তি' শব্দটি নেই। 'প্রযুক্ত' আছে। ১৯৬১ সালের 'সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধানে' শব্দটি আছে। জনি না, প্রথম প্রকাশের (নভেম্বর ১৯৫৭) ওটি ছিল কি না। ধরেই নেওয়া যায় যে বাংলায় এই শব্দটির ব্যবহার খুব বেশি দিনের নয়। অভিধানে না থাকলেও প্রযুক্তি তো ছিলই। কুমোরের চাক খুবই উঁচু দরের যন্ত্র। একটা ভারী জিনিসকেবেশ জোরে ঘুরিয়ে দেওয়ার পর ঘোরানোর জন্য প্রয়োজনীয় বল তুলে নিলেও সেটা যে অনেকক্ষণ ঘুরবে, তা ওই যন্ত্রটির আবিস্কর্তা বিলক্ষণ জানতেন। তিনি নিউটনের 'ল অব ইনারশিয়া' কিংবা 'মোমেন্টাম' বিষয়ে সম্ভবত কিছু জানতেন না। নারকোলের পাতার ডাঁটি থেকে ঝাঁটা বাঁধার পদ্ধতি লক্ষ করেছেন? গোড়ার দিকটা বেশ শক্ত করে বেঁধে একটা বাঁশের গোঁজ ঢুকিয়ে বাঁধনটাকে আরও শক্ত করা হয়, আর ঝাঁটাটাও ফুলে ওঠে যাতে এক বারে অনেকখানি জায়গা সাফ হয়। ছোরা দিয়ে পেট ফাঁসানো সহজ, কিন্তু এক কোপে পাঁঠার মুণ্ডচ্ছেদের জন্য ওই যন্ত্র কাজে আসে না, তখন চাই খড়্গ। আবার হাড়িকাঠে না বেঁধেও মানুষের মাথা কাটার যন্ত্রতরোয়াল। এইগুলিও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের দান, সেটা আমরা মনে রাখি না। এসবের ব্যবহারে আমরা অভ্যস্ত ধরিয়ে দিলে মলিয়েরের সেই চরিত্রের কথা মনে আসে। যিনি গদ্য কাকে বলে জানতে গিয়ে বুঝতে পারেন যে না জেনেই তিনি এতদিন যে ভাষায় কথা বলেছেন সেটাই নাকি গদ্য।

ব্যাপারটা দাঁড়াল এইরকম। নিজের হাত-পা, দাঁত -নখ প্রভৃতি দিয়ে যা করতে পারে না, তা করতে হলে মানুষ নেহাত প্রযোজনের তাগিদেই তৈরি করে যন্ত্র। যেমন সাঁড়াশি, চিমটে, কপিকল, লাঠি। শারীরিক ক্ষমতার প্রসার হয় এতে। এবং আশ্চর্য, এটা করতে পারে একটি মাত্র প্রাণী। তার নাম মানুষ, যাদের পর্যালোচনায় ব্যয়িত হয়েছে পরিপ্রেক্ষিতের অনেকটাই। স্বাভাবিক সামর্থ্যেরঘাটতি পূরণের জন্য মানুষ যা - কিছু করে, তাকেই বলা যায় প্রযুক্তি। টেকনোলজির এইরকম একটা সংজ্ঞাকে অস্বীকার করা চলে না। কোনো বাঁদর লাঠি নিয়ে মারামারি করেছে, এইরকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি। আর যত অগুণ থাকুক-না কেন কায়দা বার করার বিদ্যেটা একমাত্র মানুষেরই আছে। আর এই কারণেই স্বভাবতই হিংস্র প্রাণী মানুষ

নিজেদের বাঁচার তাগিদেই তৈরি করেছে একটা মিলেমিশে থাকার সুশীল - সমাজ। এই সুশীল - সমাজে প্রযুক্তির একটা বিশেষ স্থান আছে, ভূমিকা আছে। অন্য সবকিছুর মতো প্রযুক্তিনির্ভরতার ভালো-মন্দ দুটো দিকই আছে, ব্যবহার যেমন আছে, অব্যবহার এবং অপব্যবহারেরও ঘাটতি নেই।

।। বাড়ি থেকে শুরু করা যাক।।

শহরবাসী মধ্যবিত্ত সমাজের বাড়ি, দেশটা ভারতবর্ষ, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ। রান্নাঘরের চেহারা গত পঞ্চাশ বছরে অনেকটাই পালটেছে। গ্যাস, প্রেসার কুকার, চিমনি, নতুন ধরনের বাসনকোশন, রেফ্রিজারেটর, ওয়াটার ফিল্টার, ওটিজি, মাইক্রোওয়েভ, মি'ার -গ্রাউ'ার, টোস্টার, আরও কত কী? কিন্তু এখানেও 'রামা কৈবর্ত'' - রা বাদ। রান্নার জ্বালানির জন্য কাঠ, পাতা কুড়োনো, বনের গাছ কাটা, ব্ল্যাকে কেরোসিন কেনা, কয়লা চুরি, ঘেঁসের ডাঁই থেকে আধপোড়া কয়লা উদ্ধার করতে গিয়ে ধস চাপা পড়ে মৃত্যু, কোনোটাই কমছে না। অন্য সব জিনিসের মতোই প্রযুক্তির ফসলও করা ভাগে কতটা যাবে তা কোনো পরিকল্পনা সমাজে থাকে না। সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক ব্যবধান, এইসব 'গ্যাজেটের' পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সমানুপাতিক, বর্গানুপাতিকও হতে পারে। বাংলায় বললে ভালো বুঝবেন, ডাইরে*লি প্রোপরশনাল টু দি স্কোয়ার অব দা নাম্বার অব গ্যাজেটস। প্রযুক্তির অগ্রগতি সমাজের মানুষের মধ্যে ভেদাভেদটা আরও বাড়িয়ে দেয়। তবে কি এইসব জিনিসপত্র, যা মানুষকে মোটেই পিছিয়ে পড়তে দেয় না, তৈরি কিংবা আমদানি বন্ধ করে দেব? আমি রাজা হলে হয়তো আমাদের দেশের কথা বিচার করে, কতগুলি জিনিস এখনই চাইতাম না। কিন্তু সেটা হওয়ার উপায় নেই। এদের প্রস্তুতকারক, বিক্রেতারাই তো দেশটাকে চালান। আর আমরা যাঁদের ভোট - টোট দিই, তাঁদের প্রকৃত অবস্থাটা 'পথ ভাবে আমি দেব'।

একটা প্রসঙ্গ একটু ভিন্ন হলেও উল্লেখ খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কম্পিউটার নামক যন্ত্রটির সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ পরিচয়ের কথা চেনাজানারা জানেন। কম্পিউটার কেনার আগে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন কেমন কম্পিউটার কিনবেন? আমি তাঁদের পালটা প্রশ্ন করি, ওই যন্ত্রটি দিয়ে তিনি কিংবা তাঁর ছেলে অথবা মেয়ে ঠিক কী কাজ করবেন। উত্তরটা অনেকের কাছেই থাকে না। কয়েকটা হিন্ট দিই, তাঁরা সবেতেই 'হ্যাঁ' বলেন। তখন একটা 'কনফিগারেশন' -এর কথা বলি, যার দাম কম, এবং যন্ত্র হিসেবেও বেশ ভালো। কিন্তু আশ্চার্যের কথা, কেউ সেইরকম যন্ত্র কেনেন না। তাঁর থেকে পাঁচ গুণ দামের যন্ত্র কেনেন, ওই যন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির এক-শো ভাগের এক ভাগও ব্যবহার করেন না। অথচ একটা কম্পিউটার কিনে দিনে দশ - বারো ঘন্টা নানান ধরনের কাজ করে যাঁরা জীবিকানির্বাহ করেন, তাঁরা কেউই ওই বিলাসিতার মধ্যে যান না, সাধারণ যন্ত্রেই তাঁদের চলে যায়, কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া যেখানে কাজের ধরনটাই অন্যরকম।

আমাদের রান্নাঘরের ওই যে সব গ্যাজেট আমরা কিনেছি, সামাজিক জীব হিসেবে, তাদের ঠিক ঠিক ব্যবহারের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারিনি। যন্ত্র, তা যে যেকোনো যন্ত্রই হোক, মানুষের হাতের যত্ন চায়। অন্যথায় সেটি খারাপ হয়ে যায়, দুর্ঘটনাও ঘটে। যেমন গ্যাস বার্নার বন্ধ করার নিয়ম হল, নীচের অর্থাৎ সিলি'ার রেগুলেটার -এর নবটা আগে বন্ধ করা যাতে পাইপের ভেতরের গ্যাসটা পুরে যায়, এবং তার পরে বার্নারের নব বন্ধ করতে হয়। গ্যাস সিলি'ার নেওয়ার সময় তার ব্যবহারবিধিতে এটা লেখা থাকে। আমার জানাশোনা কেউই এটা মানেন না। অনেক বার অনুরোধ করেও কোনো ফল পাইনি, বরং 'বাতিকগ্রস্ত' বলে উপহসিত হয়েছি। অথচ আমার পাশের বাড়িতেই এটি না করার জন্য, একটি ভয়ানক অবস্থা হয়েছিল। কোনোরকমে সামাল দেওয়া গেছে এবংএই সামাল দেওয়াটার পেছনেও কাজ করেছে একটি আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু তার পরেও কি শোধরানো গেছে? উত্তর হল, না। প্রেসার কুকার বসানোর আগে ভেন্ট পাইপটাকে একবার দেখে নিতে হয়, ওদিকের আলো দেখা যাচ্ছে কি না। এক জনও দেখেন? বৈদ্যুতিক যন্ত্রে অনেক বিপত্তিই ঘটতে পারে। ওইরকম হলে প্রথম কাজ হল, সুইচটা বন্ধ করা। কয়েকটা বাড়ির কথা জানি যেখানে রেফ্রিজারেটরের সুইচে পৌঁছোতে গেলে আক্ষরিক অর্থেই শুয়ে পড়ে খুঁজতে হয়। আজকাল অনেক যন্ত্রেই পাওয়ার অন ইন্ডি কেটর লাইটথাকে। মি'ির কাজ হয়ে গেছে, ই' কেটর লাইট জ্বলছে, ওটা আর নেভানো হচ্ছে না। মাইক্রোওয়েভ আভেন ব্যবহারকারীদের মধ্যে এই রোগের প্রাবল্য দেখা যায়। রিমোট কন্ট্রোল সুইচে টিভি বন্ধ করার পর প্লাগের সুইচটা খোলাই থাকে, বস্তুত টিভিটা যে চলছে, কেবল স্ক্রিনটাই কালো, তা আর কাকে বোঝানো যাবে? আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে গেলে যে সক্রিয় এবং সাবধানি একটা মন চাই, তার একান্তই অভাব।

।। এবার বাড়ির বাইরে।।

ধরুন রাস্তায়। রাস্তাঘাটে অনেক আধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি দেখা যায় এবং সেটাই স্বাভাবিক। কতরকম মোটরগাড়ি, কত কিসিমেরআলো। পাওয়ার স্টিয়ারিং, পাওয়ার উইং'া, পাওয়ার ব্রেক, ব্যাক করার সময় সাদা আলো, এবং তারস্বরে খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দ। 'সারা জাঁহাসে আচ্ছা'। এক ডাক্তারবাবু হাসপাতালের মধ্যে 'ব্যাক খাঁক খাঁক' গাড়িটার জন্য তাঁর অস্বস্তির কথা আমাকেই বলেছেন। আমরা গাড়ির ব্যাপারে তো মডার্ন হলাম, কিন্তু তার ব্যবহারে মর্ডান হতে পারিনি। যেমন, হর্ন বাজানো। লোকে বিনা কারণে হর্ণ বাজায়। মাথায় তীব্র যন্ত্রণার কারণে একবার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের রাস্তার ধারের দোতলার একটি ঘরে ভরতি ছিলাম। রাস্তায় যথাস্থানে কলকাতা পুলিশের প্রথামাফিক বোর্ডও ছিল (এখনও আছে), 'নো হর্ন'। কিন্তু ওই হর্নের শব্দেই আরও বেড়ে গেল যন্ত্রণা।কলকাতার রাস্তার সবচেয়ে হর্ন - মুখরিত অঞ্চল সম্ভবত, বেগবাগানের মোড়ে যেখানে আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড ডান দিকেমোড় নিয়েছে। পরীক্ষা প্রাথনীয়। অকারণে হর্ন বাজানোর বিরুদ্ধে আইন আছে। কিন্তু আমাদের সমাজ ও সরকারের অভিভাবকরা এটাকে কোনো সমস্যা বলেই হয়তো মনে করেন না। মনে করলে প্রতিকার পনেরো দিনে করা যায়।

১৯৫৬ সাল থেকে কলকাতা শহরটাকে দেখছি। স্বভাবতই অনেক প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং অবনতির সাক্ষী। ১৯৫৬ সালেকলকাতার বড়ো বড়ো মোড়ে চার দিকে তিন - চারে বারোটা ট্র্যাফিক বাতি ছিল, সবই স্বয়ংক্রিয়। কিছুক্ষণ অন্তর পরিবর্তন হত। বোধ হয় সত্তরের দশক থেকেই এদের কিছু কিছু বিকল ও উধাও হতে থাকে। মাঝখানে এমন একটা সময় আসে যখন কলকাতায় কোনোরকম ট্র্যাফিক সিগনালই ছিল না, পুলিশের হাতনাড়া ছাড়া। ইতিমধ্যে গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে, স্টেট বাস প্রায় উঠে গেছে। সমস্তরকম আইনকানুনকে অগ্রাহ্য করে প্রাইভেট বাস উন্মাদের মতো ছুটছে। এসেছে মিনি বাস নামক একইসঙ্গে প্রয়োজনীয় এবং অসহ্য বিশৃঙ্খলা। অটো নামক অটো - রিকশা, যার অনেকেরই শহরে চলার বৈধ কাগজপত্র নেই। ওই একই উপায়ে জেলাগুলি থেকেও আসছে পারমিটওয়ালা ও বিনা পারমিটের বাস। বেড়েছে মোটর সাইকেল এবং স্কুটার। এরই মধ্যে কলকাতায় আবার ফিরে আসতেলাগল ট্র্যাফিক সিগনাল, নতুন প্রযুক্তির হাত ধরে। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা বদলে হল 'অটো - ম্যানুয়াল' ব্যবস্থা; আলোর সংখ্যা অনেক বাড়ল, রাস্তার পাশের ছোটো পোস্টের সঙ্গে যোগ হল অনেক ওপরের পোস্ট, যাতে, নাকি দূর থেকেও দেখা যায়। মোড়ে বসল পুলিসের গুমটি, তার মধ্যে 'কন্ট্রোল বোর্ড'। সবুজ আলো আর পুরো সবুজ থাকল না। সবই হল তির - চিহ্নিত। সোজা যাও, ডাইনে যাও, বাঁয়েরটায় 'ব্লিঙ্কার', অর্থাৎ দেখে যাও। আলোর আধিক্যও লক্ষণীয়। যেমন ধরুন, ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে উত্তর দিকে যেতে আটকালেন দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ে। আপনি লাল আলো দেখবেন সাতটা। উলটো দিকের ড্রাইভারও দেখবেন সাতটা। মোট চোদ্দোটালাল আলো। এটা হল নব প্রযুক্তির আতিশয্য। এর জন্য যে বাড়তি খরচ রক্ষণাবেক্ষণ ও বিদুতের জন্য হচ্ছে, তা বিবেচনা যোগ্য মনে করেন না সমাজচেতনারহিত প্রযুক্তিবিদরা। এই নব্য প্রযুক্তি মাশুল দিচ্ছি আমরা আজ কলকাতায় ট্র্যাফিক সিগনাল ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ নিরাপদে রাস্তা পার হওয়ার কোনো উপায় রাখা হয়নি। চেষ্টা করে দেখুন, রবীন্দ্রসদন মেট্রো স্টেশনের চৌরাস্তার মোড়ে, লান্সডাউন - সাদার্ন অ্যাভিনিউর মোড়ে, এবং আরও দশ - বিশ জায়গায়। যে সমাজের মানুষ ও প্রশাসন যন্ত্রের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ জানে না, সেখান বেশি কায়দা করতে গেলে গোলমালই হয়। মনে করে দেখুন, কিছুকাল আগে বিবাদী বাগের দক্ষিণ - পূর্ব কোণে অত্যন্ত মডার্ন ট্র্যাফিক আলোর জন্য অনেক খুঁটি ও আলো বসল। সাত দিনও চলেনি সে - ব্যবস্থা। জিপিও-র ঘড়ি থাকা সত্ত্বেও, রাইটার্স বিল্ডিঙের পশ্চিমে বহু ঢাকঢোল পিঁটিয়ে সোলার ক্লক বসানো হল। কোথায় সেসব? দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বেলঘরিয়াডিপোতে বসানো হল অতি উচ্চ মানের স্বয়ংক্রিয় বাস ধোলাই করা যান্ত্রিক ব্যবস্থা; দেখিনি, তবে কাগজে পড়েছি। আজ, না দেখেইবলতে পারি সেটা অচল হয়ে পড়ে আছে। হাসপাতালগুলোর দামি দামি যন্ত্রের খুব অল্পই সচল থাকে। মনের দিক থেকে যারাদরিদ্র, তাদের অন্যতম লক্ষণ হল, যা দেখে, মানে লেটেস্ট, তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়া। ভাবা হয় না, ওটা আমার এখনই দরকার কি না। এটা আমার ধাতে সইবে তো? কী করা যাবে অপব্যয়িতা মানসিক দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ ফল।

।। দুই।।

।। তাহলে আপনি কী বলতে চান মশাই?।।

প্রশ্নটা অনেকবার শুনেছি। আপনি কি বলতে চান অন্য সব দেশ নতুন নতুন টেকনোলজি ব্যবহার করে কোথায় চলে গেছে, আর আমরা এখনও গোরুর গাড়িই চালিয়ে যাব? উদাহরণ

বাড়িয়ে অভিযোগের আয়তনটা অনেক বাড়ানো চলে। তবে তার দরকার নেই।উত্তরটা অন্যভাবে দেওয়া হবে। উন্নত দেশগুলোর সম্পূর্ণ চেহারাটা দেখতে হবে। এবং আমাদের সমাজে কোন প্রযুক্তি কখন কতটানেওয়া হবে তার একটা অগ্রাধিকারের তালিকাও বানাতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের দেশটা গরিব, অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষই গরিব। আমরা ইন্টারনেটে আমেরিকার সমকক্ষ হব, সাক্ষরতায় হব না, এক লক্ষ লোকের স্টেডিয়াম বানাব, খেলার প্রতিযোগিতায় যেতেই পারব না, এটা কোনো কাজের কথা নয়। জিডিপি, জিএনপি, এফডিআই এর অঙ্ক দেখিয়ে লোককে বোকা বানানো যায়, তাদের সত্যিকারের প্রয়োজন মেটানো যায় না। অর্থনতিবিদদের অনেকেই অধুনা একথা বলেন।

মুশকিলের কথা হল, আজ আমাদের সরকারও বিশ্বায়নের খেলায় মেতেছেন। তাঁদের 'পুজি' চাই। পুঁজির জাত নেই। আমরা নাকি আইটিতে এগিয়ে গেছি। ইনফরমেশন টেকনোলজির দু-টি দিক। একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম লেখা। কাজটি কঠিন। বুদ্ধি, ধৈর্য, কোনো বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে বোঝার দরকার হয়, এবং এরজন্য এক ধরনের মানসিক প্রস্তুতিও লাগে, যা সবার থাকে না। জয়েন্ট এন্ট্র্যান্সে ফাস্ট হলেই কোনো ছাত্র এই গুণ অর্জনের অধিকারী হবে, তা বলা যায় না। কম্পিউটার যন্ত্রের কোনো বুদ্ধি নেই। এইযন্ত্র দিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান করাতে হলে, সমাধানের সূত্রটি আগেই কষে দিতে হয়। দ্বিতীয় ধরনের কাজটি হল যন্ত্রে ধরে রাখা সমাধান সূত্রটি ব্যবহার করে যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করা। যেমনটি আমরা দেখি ব্যাঙ্কে, ট্রেনের রিজার্ভেশন কাউন্টারে, এবং অন্যত্র। দ্বিতীয় ধরনের কাজ করতে কোনো ভাবনাচিন্তার দরকার পড়ে না, কেবল জানতে হয় কোন কাজের জন্য কোন বোতামটি টিপতেহবে। জনরব, পশ্চিমবঙ্গ আইটি -তে এগিয়ে গেছে। সল্ট লেকের আইটি সে*রে লগ্নি করবেন অমুকে এত কোটি টাকা। শর্ত, সেখানে বন্ধ হবে না। সেখানে পুজোর ছুটি নেই, শ্রমিক ছাঁটাই করলেও কোনো প্রতিবাদ হবে না এবং ইত্যাদি প্রভৃতি। কেন? কল সেন্টার বলে একটা জিনিস তৈরি হয়েছে, এবং সেখানে অনেকে চাকরি পাচ্ছে। অতি সুখের বিষয়। হয়েছে বিপিও বলে একটা কল, পুরো নাম বিজনেস প্রসেস আউটসোসিং। কিন্তু মূলত কী এইসব কল সেন্টার? অনেক ধরনের আছে। একটা হল এইরকম। যেমন, বিলেতে ব্যাঙ্কে কেরানি পোষার খরচ অনেক এবং বিলেতের এক টাকা এখানে সত্তর -আশি টাকা হয়ে যায়। অনেক কম খরচে ভারতীয কেরানি পাওয়া সম্ভব। তাই ওদের ব্যাঙ্কের জাবেদা খাতাটি থাক ভারতে। ওখানকার কোনো লেন - দেন ইন্টারনেট অথবা ই-মেলের মাধ্যমে হচ্ছে এখানে। বিলেতে তো আর দুর্গা পুজো, বন্ধ নেই এবং সময়টাও তো এক নয়। তাই চব্বিশ ঘন্টা, তিন-শো পঁয়ষট্টদিন খোলা রাখতে হবে আমাদের কল সেন্টার। শুধু বিলেত কেন, আমেরিকা আছে, অন্য দেশও আছে। এইসব কল সেন্টারে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের কয়েক জনকে চিনি। কোনোদিন রাত তিনটেয় বাড়ি ফেরা, কখনো সকাল ছ-টায়। বছর খানেক কাজ করে অনেকেই পালাই পালাই করছে। আমাদের সরকার গুণ গাইছেন আইটি-র অভূতপূর্ব সাফল্যের। আমি দেখতে চাই উলটোটা। আমাদের এক টাকা ওখানে হবে পঞ্চাশ টাকা। আমাদের ব্যাঙ্কের কেরানি হবে সাহেবরা, এবং এই কারণেই ওরা পাবে না বড়োদিন ও নতুনবছরের ছুটি। জানি, এটা একদিনে হবে না, কিন্তু এরকম হওয়ানোর কোনো ভাবনাও কি মাথায় আছে 'পথ ভাবে আমি দেব' - দের। এতটা তলিয়ে ভাবতে না পারার জন্যই বন্ধ কারখানার জমিতে উঠছে বহুতল। বিক্রি হচ্ছে সব ফ্ল্যাট, কিন্তু সবই খালি। মালিকরা থাকেন বিদেশে, বছরে একবার হয়তো আসেন। রাজারহাটে এক ফ্ল্যাট মালিকের মুখেই শুনেছি ওইসব আবাসনের দারোয়ানের খেদোক্তি। 'সব ফাঁকা, আপনারা আসুন, থাকুন, নইলে কাদের পাহারা দেব। এতগুলো ফাঁকা বাড়ি পাহারা দিতে আমাদেরই ভয় লাগে।'এই প্রশ্ন করে কোনো লাভ নেই যে কেন বন্ধ কারখানার জমিতে নতুন কারখানার বদলে হচ্ছে বহুতল আবাসন।

।।এখন আমাদের কী দরকার।।

কাগজে প্রায়ই দেখা যায় এত কোটি টাকা খরচ করে মাধ্যমিক স্কুল, এমনকী প্রাইমারি স্কুলে কম্পিউটার দেওয়া হবে। এইআমলে ওই যন্ত্রটির সঙ্গে ছোটো বয়সেই পড়ুয়াদের পরিচয় হলে খারাপ কিছু হয় না। কিন্তু একটা স্কুলের চাহিদাগুলিকে পর পর সাজালে কোনগুলি আগে আসে? পড়াতে - জানা এবং পড়াতে ইচ্ছুক শিক্ষক, একটা বাড়ি এবং সেটার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা, খাবার জলের বন্দোবস্ত - ধরা যাক একটা টিউবওয়েল এবং সেটাকে চালু রাখার ব্যবস্থা, শৌচাগার এবং সেটাকে নিয়মিত সরবরাহ, ভুলহীনপাঠ্যপুস্তক, খাতা - পেনসিল, কলম। তার পরে আসে কম্পিউটার, যদি সে স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ থাকে এবং কম্পিউটারের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা, তা শেখাবার জন্য যোগ্য শিক্ষক। পাঠক অ্যাট র‍্যা'ম হাজার খানেক ছোটো - বড়ো স্কুল ঘুরে এসে মিলিয়ে দেখুন একবার। অবস্থাটা এমনই যে মাধ্যমিকের অঙ্ক বইতে ভুল শোধরানোর জন্য শিক্ষক মহাশয়কে সব দরজায় ব্যর্থ হয়ে শেষে ধাওয়া করতে হয় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দরজায়। অথচ এই কাজ করার জন্যই মাইনে-খাওয়া লোকের অভাব নেই।

বোধ হয়, ১৯৮৮-১৯৯০ সালের কথা। ডিপার্টমেন্ট অব সায়েন্স অ্যা' টেকনোলজি, দিল্লির একটা স্কিম শুরু হল মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। সারা ভারতের বড়ো বড়ো শহরের বড়ো লাইব্রেরিগুলোকে যোগ করার আয়োজনের নাম হল 'ক্যালিবনেট'। অনেক কম্পিউটার, সার্ভার কেনা হল। লোকজনদের ট্রেনিং চলল। সফ্টওয়্যার বানানোর ভার পড়ল কলকাতার সিএমসি নামক এক সংস্থার্যপর। খরচা হয়ে গেল কোটি টাকারও বেশি। শেষপর্যন্ত কিছুই হল না। যাবদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে এখনও পড়ে আছেসেইসব যন্ত্র। অন্যত্রও আছে। কাজটা হল না, কিন্তু সরবরাহকারীরা, ট্রেনাররা সবাই টাকা কিন্তু পেলেন। কিন্তু কাজটা কেন হল না?এই প্রশ্ন তোলা যাবে না। টাকার অপচয়ের জন্য কোনো কৈফিয়তও যে কাউকে দিতে হয়েছে, এমন শুনিনি। আসলে যখন এইরকমটা ভাবা হয়েছিল তখন মনের দিক থেকে আমরা তারজন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ছোট্ট একটা ইউনিট ধরে পুরো ব্যাপারটার ট্র্যায়ালও দেওয়া হয়নি। কম্পিউটার দিয়ে লাইব্রেরি যোগ করার ব্যাপারটার স্ফরূপটাই জানা ছিল ন। কিন্তু নামটার মধ্যে একটা গ্ল্যামার ছিল। আর বিক্রেতারা সেটাই খাইয়ে দিয়েছিলেন কর্তাদের। এই প্রতিবেদনের তথ্যগুলো পেয়েছিলাম যাবদপুরের প্রাক্তন চিফ লাইব্রেরিয়ান রামকৃষ্ণ সাহার কাছে।

কিন্তু এই কালো দিকটাই সব নয়। ১৯৯৫-এ 'ইনফ্লিনেট' (ইনফরমেশন লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক' সম্ভবত, ইউজিসি-র তত্ত্বাবধানে, লাইব্রেরিগুলির মধ্যে তথ্য বিনিময়ের ব্যবস্থা শুরু হয়। যতটা আশা করা গিয়েছিল, ততটা না হলেও এটি কাজে লাগছে। কেন এমন হল? কেন এমন হল? কম্পিউটার যন্ত্র যে ভগবান নন, ১৯৯৫-এ সেটা আমরা বিলক্ষণ জেনেছি। পূর্বপ্রস্তুতিটা অনেক বিশদভাবে নেওয়া গিয়েছিল। কিন্তু আবার ওই ১৯৯০ সাল নাগাদই হবে। কলকাতার ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোকে কম্পিউটারের মাধ্যমে যোগ করার আইডিয়াটা কোনো চতুর ব্যক্তি 'দোজ হু ম্যাটার' - দের মাথায় ঢুকিয়েছিলেন। কলকাতায় ক-টাই -বা ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে, আর তাদের ভাণ্ডারগুলোও বিশাল কিছু নয়। ফোন তুলেই জিজ্ঞাসা করা যায় কার কাছে কোনো বিশেষ গ্রুপের রক্ত আছে কি না। কিন্তু কম্পিউটার না হলে মান থাকে না। বেশ কিছু টেলিফোন লাইন নেওয়া হল, কেনা হল কম্পিউটার। কাজ অবশ্য কিছু হয়নি। স্বেচ্ছারক্তদান আন্দোলনের কর্মী ও কলকাতার 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স' -এর কম্পিউটার বিভাগেরপ্রধান সুব্রত রায় আমাকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। একদিন নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে ওই হাইটেক ব্যবস্থার খোঁজ নিতে গিয়ে আবিষ্কার করেন যে কম্পিউটারটিতে ধুলো জনেছে, ওটা কোনোদিনই ব্যবহার হয়নি, আর টেলিফোনটি ব্যবহার করছেন একজন ডাক্তারবাবু, না তাঁর বাড়িতে নয়, হাসপাতালেই।

।।এখন প্রযুক্তির ব্যবহারের বিষয়টা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে।।

অনেক শিল্প তৈরি হবে। দেশি - বিদেশি শিল্পপতিরা খুবই উৎসাহী পশ্চিমবঙ্গে কারখানা বানানোর জন্য। খুবই বালো কথা আমাদের প্রগতিশীল মুখ্যমন্ত্রী খুবই সুনাম পাচ্ছেন তাঁর আধুনিক চিন্তাভাবনা ও কিছু কাজের জন্য। সুনামটা অকারণেও নয়। টাটারা মোটর গাড়ি বানাবেন এ-রাজ্যে। ওই কারখানা হলে কিছু মানুষের চাকরিও হবে। পূর্ব দেশের আর একজন মহাভারত গড়বেন যা কিনা আদতে মোটর সাইকেল। বিমান বন্দর হবে। এসবের জন্য জমি লাগবে। কোন জমি? যেখানে চাষ হয়। চাষিরা প্রতিবাদ করছেন, মদত দিচ্ছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা। বিরোধী শধু নামেই, কারণ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এই প্রজাতিটি বিলুপ্ত, এই বিলুপ্তি থেকে তাঁদের বাঁচাতে কোনো শিল্পপতি লগ্নি করবেন, এমন সম্ভাবনা কম। এই লগ্নিতে কোনো লাভের আশা নেই। সব জমিতেই চাষের বদলে শিল্প হলে যে উদরান্নসংস্থান হবে না, এই সত্যটা আমাদের রাজারা বোঝেন না, তাও নয়। এখন শুনতে পাচ্ছি শিল্প কতটা জমি পাবে আর কৃষির জন্য কতটা থাকবে সে অঙ্কটা কষা হচ্ছে। সত্যিই যদি তা হয়, এবং যিনি কিংবা যাঁরা অঙ্কটাকষে বিধান দেবেন তাঁরা যদি ঠিকমতো সেটা কষেন, তবে ভয়ের কিছু নেই। আর অত ভয় পেলে কি রাজ্য চালানো যায়। কিছুদিন চলার পর যদি ফলাফলটা উলটে যায়, তখন কী হবে সে - ভাবনাটাও ভাবা হয়েছে কি না জানি না। প্রযুক্তিবিদরা প্রথমে একটা ছোটো মাপের মডেল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। পরে বড়ো আকারে সেটা বাজারে ছাড়েন। গবেষণা চলতেই থাকে, নতুন প্রযুক্তি পুরোনোটাকে হটিয়ে দেয়, একদিনে নয়, ক্রমে ক্রমে। আমাদের চোখের সামনেই তো টেলিফোনের কত পরিবর্তন হল। আরো অনেক কিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে। যে কোনো সমাজই এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়েনেয়, নিতেই হয়। কিন্তু তার একটা অগ্রাধিকার থাকে। একটা উদাহরণ দেব। আমাদেরই দেশে হিমাচলপ্রদেশ, হরিয়ানা সব গ্রামেই বিদ্যুৎ গেছে। পশ্চিমবঙ্গে যায়নি। এখানে বিদ্যুতের অভাব আছে, তা ছাড়া মাঝেমধ্যে যন্ত্র, সংযোগ ব্যবস্থা বিকল হলেও, কোনো কোনো জায়গায় বিদ্যুৎ থাকে না। এখন বিদ্যুৎ আর কোনো লোকাল ব্যাপার নয়, প্রায় সব উৎপাদন কেন্দ্র গ্রিড -পদ্ধতিতে জোড়া। গ্রামকে অন্ধকারে রেখে কলকাতায় প্রচুর বিদ্যুতের অপব্যবহার আমরা কতদিন সামলাতে পারব। অপব্যবহার বলছি দুটো কারণে। কোনো জিনিস

থাকলেই তাকে যেকোনো কাজে লাগাব কি? কারণ বিদ্যুৎ এখনও প্রধানত যে-জিনিস থেকে উৎপন্ন হয়, তার ভাণ্ডার সীমিত, এবং সে - জিনিস আমরা বানাতে পারি না। কলকাতা শহরে এখন বিজ্ঞাপনে বিপুল বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে। বিশাল বিশাল হোর্ডিং,তাতে দশ থেকে কুড়িটা, হাজার ওয়াটের হ্যালোজেন ল্যাম্প জ্বলছে। এখন দশ ফুট বাই কুড়ি ফুট 'ব্যাক - লিট' বিজ্ঞাপন সর্বত্র, প্রতিটিতে গোটা পঞ্চাশেক চার ফুটের টিউব লাইট। প্রতিটি ল্যাম্প পোস্ট, আর ট্রামের তারের খুঁটিতে 'ব্যাক - লিট', 'গ্লো - সাইন'। প্রতিটিতে কমপক্ষে চার থেকে ছ-টা টিউব লাইট। বাস স্টপের মাথাতেও 'গ্লো-সাইন'। তিন দিক ঘিরে অন্তত কুড়ি -পঁচিশটা টিউব। আস স্টপের পেছনেও বিজ্ঞাপন, তাদের আলোকিত করছে অন্তত দুটো পাঁচ-শো থেকে দেড় হাজার ওয়াটের হ্যালোজেন ল্যাম্প, হংটতে গেলে চোখ ধাঁধায়, গরমে দাঁড়ানো যায় না। বাস স্টপ ছাড়াও যত্রতত্র গজাচ্ছে এইরকম ছাউনি। আমাদের কয়লা পুড়িয়ে (মূলত) তৈরি - করা বিদ্যুৎ তোমার পয়সা আছে বলেই এইভাবে খরচ করবে, তা হতে দেওয়া চলবে না, কারণ আমাদের দেশ এখনও সে - অবস্থায় আসেনি। কেবল পার্ক সার্কাসের মোড়েই বিজ্ঞাপনে আলো দেওয়ার জন্য যে-পরিমাণ বিদ্যুৎ লাগে তাতে পাঁচ - সাতটা গ্রামে আলো দেওয়া যায়। ইস্টার্ন বাইপাসের কথা ছেড়েই দিলাম। প্রবল বিদ্যুৎ ঘাটতির সময়ও বিজ্ঞাপনের আলো বন্ধ করেসাশ্রয় করার নিয়মও আমরা করতে পারিনি।

আবার শুনতে পাই, কাগজেও পড়ি, আমাদের অনেক কিছুই হয়েছে, তবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক কাজ নাকি বাকি আছে। সর্বনাশ, শিক্ষা আর স্বাস্থ্যই যদি গেল, তবে থাকল কী? এদিকেও নজর দেওয়া হবে, তবে কোন প্রযুক্তিতে হবে সেটা এখনওপরিষ্কার নয়। একসময় মনে হয়েছিল, শিক্ষকরা বেতন কম পান, তাই এমন অবস্থা। শিক্ষকদের বেতন বাড়ানো হয়েছে অনেক দিনে ভালোই পান তাঁরা। কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটা পূরণ হয়নি। বেতনপ্রযুক্তি এখানে ব্যর্থ হয়েছে। এদেশের একজন শিক্ষাবিদ ২০০৫সালে বলেছিলেন, 'কলেজগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ'। প্রশ্নটা ছিল 'ন্যাক' অথবা 'নাক' কী? কলেজগুলো পরিদর্শন করে এই কমিউটি 'গ্রেড' দেন এবং ইউজিসি সেই 'গ্রেড' বিচার করে অনুদান ইত্যাদি কতটা দেবেন, সেটা ঠিক করবেন। 'ন্যাক' কিংবা 'নাক' হল 'ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল। এটি সম্ভবত প্রাইভেট কাউন্সিল, হেড অফিস ব্যাঙ্গালোরে। ইউজিসি দের অ্যাসেসমেন্টকে মান্য করে। গ্রেডশনও মানে। কলেজগুলোকে অনেক টাকা খরচ করে 'নাক' আনাতে হয়। তার জন্য কলেজের শিক্ষকরা চাঁদা দেন। বাড়িঘর সাফ হয়। 'নাক' - এর লোকজনদের ভালো হোটেলে রাখতে হয়, ভালো খাবারের দোকানে (যেখানে ওয়েটাররা ইংরেজিতে কথা বলে) খাওয়াতে হয়, উপহার দিতে হয়। না, 'নাক' - এর লোকেরা চান না, তবুও দিতে হয়। ভালো গ্রেডপেলে সুযোগসুবিধে বাড়ে। এতে কলেজের উন্নতি হয়।

।।একটু বেপথু হয়ে গেছি, পথে আসি।।

শিক্ষা, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক কিছু করার আছে, বলেছেন সরকার। শুনে খুব ভালো লাগল ইদানীং 'এনআরআই'-র কলকাতায় বড়ো মুগ্ধ হচ্ছেন। 'সো মেনি ফ্লাই - ওভারস, স্মুদ রোড সারফেস, ট্রিম - লাইন্ড রোডস, সো গ্রিণ'। এর মধ্যে ভুল নেই কিছুই, বিশেষ করে দক্ষিণ, এবং অধুনা, পূর্ব কলকাতার কথা ধরলে। রাজাবাজার, বউবাজারের ছবিটা অন্যরকম তবে সেখানে তাঁরা যান না। হচ্ছে নতুন প্রযুক্তির স্কুলবাড়ি, সে বিশাল কারবার; কতরকম আধুনিক বন্দোবস্ত। ঝকঝকে হাসপাতাল, তাতে নতুন প্রযুক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা, নানারকম উর্দিপরা লোকজন। নতুন নতুন পাঁচতারা হোটেল, যারা একটার উদ্‌বোধনে দু-জন আদ্যন্ত বঙ্গসন্তান আপ্লুত হয়ে বললেন 'নববর্ষের উপহার'। তারপর 'খালপাড়ের ঝোপড়ি উচ্ছেদে' যাঁরা উদ্‌বাস্তু হলেন, তাঁদের বাসস্থানের জন্য ওই 'উপহার' কোনো কাজে এল না। ওইসব বিপুল আয়োজনের বিদ্যালয়, হাসপাতাল, হোটেল আমাদের কত জনের কাজে লাগছে? আমাদের জন্য, সমাজের অধিকাংশ মানুষের জন্য, নতুন প্রযুক্তি কেমন ব্যবহার হচ্ছে একবার গিয়ে দেখুন সরকারি হাসপাতালে। জেলা শহরে যেতে হবে না, কলকাতার হাসপাতালগুলোর আউডোরে দু-দিন দাঁড়ান। জবাবটা হাতেনাতে পাবেন। জানতে পারা যাবে কেমন করে নতুন প্রযুক্তি ও বিশ্বায়ন আমাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছে না। আমরা একেবারেই 'রিটিন অফ'। একথা এক বারও বলছি না যে, এই হাসপাতালগুলোর জন্য সরকার কিছুই করছেন না; কিছু কর্মচারী ধান্দাবাজ হতে পারেন কিন্তু সবাই তা নন। ডাক্তারবাবুরাও অযোগ্য ও অনিচ্ছুক নন। দুর্নীতিও আছে, সুনীতিও দুর্লভ নয়। কিন্তু সব ব্যবস্থাই যে বানচাল হচ্ছে, তার কারণ রোগীদের সংখ্যার চাপ। পাঁচ - ছ ঘন্টার আউটডোরে তিন - শো রোগী দেখা সম্ভব নয়। প্রশ্নটা এইরকম, যিনিসংখ্যায় বেশি ভোট পান, তিন কেষ্টবিষ্টু হন। যেখানে অনেক মানুষ চিকিৎসার জন্য যান সেই হাসপাতালগুলোকে কেন 'কেষ্টবিষ্টু' গ্রেড দেওয়া হবে না? কেন সেখানেই বসবে না আধুনিকতম যন্ত্র, এবং তাকে সচল রাখর জন্য থাকবেন প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মী? এই প্রশ্নের জবাব নেই। তথ্য বিচার করে একটা কথা বলাই যায়, 'সবই কি ভিখিরিদের জন্য হবে'। ভারী আশ্চর্য লাগে যখন শুনি, 'এই কলকাতাতেই হবে পৃথিবীর বৃহত্তম শপিং মল'। কিন্তু প্রযুক্তির এই স্বর্ণযুগে আমরা যে শুনতে চাই অন্য কথা। যেমন, এই কলকাতাকে থাকবে না একজনও ভিক্ষাজীবী, একজনও ঝুপড়িবাসী, একজনও ফুটপাথাশ্রয়ী, একজনও বেকার, একজনও দাগি আসামি, একজনও শিশুশ্রমিক এবং ইত্যাদি প্রভৃতি। শুধু কলকাতা কেন, সারাটা রাজ্যেই এইরকম দেখতে চাই। তারপর 'শপিং মল' হোক - না। ব্যবসায়ীরা গড়ে তুলুন নতুন প্রযুক্তির 'বিশ্ববিদ্যালয়', লাভের জন্য নয়, শিক্ষার প্রসারের জন্য। ভাবা যায়?

।।তিন।।

।।তথ্য প্রযুক্তি।।

এখন এদেশের যত ভালো ছাত্র - ছাত্রী আছেন, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক কিংবা সম-জাতীয় পরীক্ষায় শতকার ১০০ নম্বরই পেয়ে থাকেন, এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্সে, সংক্ষেপে 'জয়েন্টের' র‍্যাংকিং -এ সবথেকে উঁচুতে থাকেন, তাঁদের উচ্চশিক্ষার বিষয় মাত্র তিনটি। কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনি' এবং আইটি বা ইনফরমেশন টেকনোলজি। ওখানে না পেলে, তবে অন্য বিষয়। কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে এবং সেটা সবসময়েই থাকবে। কম্পিউটার নামক যন্ত্রটি আমাদের সমাজকে অতি কম সময়েই অনেকটাই বদলেদিয়েছি। এ ছাড়াও সারা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের কম্পিউটারকে জুড়ে দেবার যে - ব্যবস্থা, যার নাম ইন্টারনেট, তাতেও আমাদের নানা সুবিধে হচ্ছে, যার তালিকাটি এতই দীর্ঘ ও বিচিত্র, সেটাকে নিয়েই একটা বড়োসড়ো প্রবন্ধ লেখা চলে। যন্ত্রের ব্যবহার তো নতুন কিছু নয়, কিন্তু প্রথম আবির্ভাবেই এটি এত সাড়া ফেলল কেন, এবং সাড়াটি এমনই যে আমাদের সব মেধাবীকে টেনে নিয়ে গেল, অন্য বিদ্যার জন্য রইল কেবল মধ্যমেধার লোকজন। আগেই বলেছি, কথাটা এতটা সরল সত্য নয়। অনেক ভালো ছাত্রই ডাক্তারি পড়াটাকেই প্রাধান্য, দেন, ইঞ্জিনিয়ারিং -এর অন্য বিষয়গুলির পড়ার জন্যও কেউ আগে থেকেই ভেবে রাখেন। বিশেষ কোনো কলেজে পড়বার আগ্রহ থাকে কারও কারও। তবে পিয়োর সায়েন্স, এবং বিশেষ করে পিয়োর আর্টস পড়ার কথা অনেকেই ভাবেন না। এখানে মেধার ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ওইসব বিষয়ের একটা আসনও অবশ্য ফাঁকা যায় না, তার কারণ পড়ুয়ার সংখ্যার তুলনায়আসন কম।

কম্পিউটার যন্ত্রের এই ব্যাপক দাপটের মূলে আছে এক ধরনের ম্যাজিক। এই যন্ত্রটি আগে থেকে শিখিয়ে না দিলে কোনো কাজই করতে পারে না। কিন্তু শিখিয়ে দেওয়ার পর যখন তা করে তখন আশ্চর্যই লাগে। কম্পিউটারে 'বিদ্বান' করে তোলবার জন্য যে নির্দেশ তার সাধারণ নাম 'প্রোগ্রাম'। কাজটি কঠিন, কিন্তু এই কঠিন কাজটি যাঁরা করেন, তাঁর বুদ্ধিমান এবং বিনয়ী। এতটাই যেতাঁদের নিজেদের কৃতিত্বটাও দিয়ে দেন কম্পিউটারকেই। ব্যাঙ্কে আপনার প্রাপ্য সুদ কম্পিউটার নাকি নিজে নিজেই আপনার অ্যাকঅউন্টে দিয়ে দেয়। আবার তার থেকে ইনকামট্যা'ও কেটে নেয়। 'কী করব বলুন, মেশিন কেটে নিয়েছে, আমাদের কোনো হাত নেই'। 'কিন্তু ওই না কাটার জন্য অনুরোধের কাগজটা জমা দিলাম'। 'দিয়েছেন বুঝি, সেটা তাহলে এন্ট্রি করা হয়নি'। এই এন্ট্রিটা কম্পিউটার পারে না, মানুষকেই করতে হয়।

এত ভালো ভালো ছেলে - মেয়ে আইটি - তে যাচ্ছে, তার কারণটা কী সত্যিই ওই বিষয়ে গভীর জ্ঞান সংগ্রহের জন্য? ঘটনাটা তা নয়। এটা পাশ করলে ভালো চাকরি পাওয়া যায়। আজকের সমাজে যাঁরা অন্য বিদ্যাতেও ভালো করছেন, তাঁরাও না খেয়ে আছেন, এমনটা দেখিনি। হয়তো একটু কম খান। কিন্তু নাম তো তাঁদেরই হয়। একটা সময় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্র - ছাত্রী ভরতি করার কাজ করতে হত, চাকরির সুবাদেই। হয়তো ৩৫০ র‍্যাংকের অধিকারীটি তার সামনে তখন বসে আছে ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩ -র। তখন আলাপ করার সুযোগ হয়। 'ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আসছ কেন?' এটা পড়লে ভালো চাকরি পাওয়া যায়, এই উত্তরটা অনেখেই দিতে চায় না। তাই নীরব থাকে। 'সিনেমার একজন নামকরা হিরোর নাম বলো তো'। সঙ্গেসঙ্গেই উত্তর আসে। 'একজন ডাকাত, একজন খুনি, একজন সংগীত শিল্পী, একজন কবি, একজন সাহিত্যিক, একজন বিজ্ঞানী, একজন ডাক্তার, একজন ক্রিকেটার, একজন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী?' সব প্রশ্নেরই উত্তর আসে। একজন নামকরা ইঞ্জিনিয়ারের নাম বলো তো?- নীরবতা।

প্রথমেই বলেছিলাম, মানুষকে সবকিছুই শিখতে হয়। হাঁটা, ভাষা, আঁকা, কথা বলা। শেখা মানে তো কিছু নির্দেশ মনে রাখা, কিছু প্রক্রিয়াকে অভ্যাসের মধ্যে নিয়ে। তার মানে আমাদেরও কাজ করার জন্য কিছু পূর্বনির্ধারিত 'প্রোগ্রাম' মেনে চলতে হয়। ছোটোবেলা থেকেই চলে এই প্রোগ্রামিং। এটা করে দেন আমাদের মা - বাবা, শিক্ষকরা। 'সদা সত্য কথা বলিবে', 'লেখাপড়া করে যে,গাড়িঘোড়া চলে সে', 'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়', এই সবই প্রোগ্রাম, কিংবা একটা বড়ো প্রোগ্রামের অন্তর্গত 'স্টেটমেন্ট'। আর মানুষ তো

আর যন্ত্র নয়, যে, যা তার মধ্যে ভরা হবে সবই মেনে চলবে। তাই অনেকে তার অন্যথাও করেছে। কেউ সদাই সত্য কথা বলছে, কেউ কেউ না বলিয়া পরের দ্রব্য নিতেই অব্যস্ত।

কিন্তু আধুনিক এই প্রযুক্তির সমাজ, মানুষকে অনেকটাই যন্ত্র বানিয়ে ফেলেছে। ওই যে হাজারে হাজারে ছাত্র ৯০-৯৫ শতাংশ নম্বর পাচ্ছে, এবং এই পাওয়ার ফলে নম্বরটাই তার মর্যাদা হারিয়েছে। এরা সবাই কি মেধার জোরে পাচ্ছে? মেধাবীদের ছোটোকরছি না, তাদের ছোটো করা যায়ও না। কিন্তু অধিকাংশই পাচ্ছে প্রোগ্রামিং -এর জোরে। ওই যে টিউটোরিয়াল হোম, কোচিং, এক-এক জনের ছ-জন গৃহশিক্ষক। এক ছাত্র কেমিস্ট্রিতে ১০০ পেয়েছে। পরীক্ষার তিন মাস পরে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সে ডালটনসাহেবের নাম শুনেছে কি না। উত্তরটা ছিল, 'হ্যাঁ'। 'তা ওই সাহেব এমন কী করেছিলেন যে তার নাম তোমাকে শুনতে হল?' অনেকক্ষণ নীরবতার পর উত্তর হল, 'আই রেড, বাট আই ফরগট'। জানা এবং ভোলার মধ্যে নব্বই দিনের ব্যবধান। এর দ্বারা নিশ্চয়ই প্রমাণ না যে কেমিস্ট্রিতে ১০০ পাওয়ার পূর্বশর্ত হল কোনো কিছু জানা এবং তা নব্বই দিনে ভোলার ক্ষমতা থাকা। বহু ছাত্রই উত্তরটা ঠিক দেবে। ওই বিশেষ ছাত্রটিই ওই প্রোগ্রামটাকে ডিলিট করে দিয়েছে এবং এদের সংখ্যাও খুব কম নয়।

আধুনিক প্রযুক্তির সমাজে ছোটোদের প্রোগ্রামিংটা শুরু হয় এইভাবে। তুমি একটি মানবশিশু। তোমার জীবনের একটাই উদ্দেশ্য, টাকা রোজগার। না, প্রত্যক্ষভাবে চুরি-ডাকাতি করে না। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে। ক্লাসে প্রচুর নম্বর পাবে। শুধু প্রচুর হলেই হবে না। সেটা যেন তোমার সহপাঠীদের থেকে বেশি হয়। অনেক টাকা দিয়ে অনেক ভোগ করবে, অনেক খাবে, গাড়ি, ফ্ল্যাট করবে। দেখবে তোমার গাড়িটা যেন তোমার সহকর্মীদের থেকে বেশি দামের হয়। দেখো, দয়া - মায়া প্রভৃতি দোষ যেন তোমাকে দুর্বলনা করে। তোমার সহপাঠী তোমার বন্ধু নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী। ফলত, অঙ্কে ১০০ পেয়েও প্রবল কান্না মুন্নির, তার সহপাঠী বাঞ্ছারাম বসুও কেন ১০০ পেয়েছে।

তবে, পৃথিবীর একমাত্র হিংস্র প্রাণী হয়েও মানুষ যে-গুণের জন্য গড়তে পেরেছে সুশীল - সমাজ, সে - গুণটাও অবশ্য মানুষকে শিখতে হয় না। সবার না থাকলেও অনেকের মধ্যেই থাকে। সব কম্পিউটারকেই প্রোগ্রামের আওতায় আনা যায়, বস্তুত আনতেই হয়, কিন্তু সব মানুষকেই 'প্রোগ্রাম্‌ড' মানুষ কার যায় না। এটাই ভরসা।